নারীমুক্তির রাজনৈতিক সংগ্রাম

জলি তালুকদার

প্রকাশন

নারীমুক্তির রাজনৈতিক সংগ্রাম
জলি তালুকদার
গ্রন্থস্বত্ব © লেখক ২০২৬
প্রচ্ছদ: দীপ্তি দত্ত
প্রচ্ছদে ব্যবহৃত শিল্পকর্ম: শিল্পী সুমনা আক্তার, বিষণ্ন কাঁথা-৪, ২০২৫
[কাপড় ও সুতায় বোনা নকশিকাঁথা]

প্রকাশক: দ্যু প্রকাশন
প্রথম প্রকাশ: ফাল্গুন ১৪৩২, মার্চ ২০২৬

Nari Muktir Rajnaitik Sangram
[POLITICAL STRUGGLE FOR WOMEN'S LIBERATION]
by Joly Talukdar
Copyright © Author 2026
Cover Designed by Dipti Datta
Artwork on the Cover: Bishanna Kantha -4, 2025
by Artist Sumana Akhter
First Published: March 2026 by Dyu Publication

www.dyu.com.bd
ISBN: 978-984-74101-8-0
Printed & Bound in Bangladesh

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form, of by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the prior written permission of the author and publisher, except where permitted by law.

উৎসর্গ

কমরেড হায়দার আকবর খান রনো
—শিক্ষক, নেতা ও সহযোদ্ধা

সূচিপত্র

কয়েকটি কথা	৯
যে সংকটের কোনো নাম হয় না	১১
রাষ্ট্র বনাম নারী	২০
প্রেম, বিয়ে ও যৌনতার রাজনীতি	২৮
ধর্ষক ও ধর্ষণ, নিপীড়নের রাজনীতি এবং লড়াই	৩৬
মজুরি দাসত্ব ও গার্হস্থ্য শ্রম থেকে মুক্তি	৫১
যারা পথ দেখালো	৬০
নারীমুক্তি দেশে দেশে	৮৪
একজন রোজা লুক্সেমবার্গ	৯৮
অক্টোবর বিপ্লবের পথ ধরে	১১৫
মার্কসবাদ ও নারীমুক্তি	১২৪
নারীমুক্তি ও প্রলেতারিয়েত নারী	১৩৫
আগামীর মুক্তি সংগ্রাম	১৪৩

কয়েকটি কথা

নারীমুক্তির প্রশ্নটি একেবারেই রাজনৈতিক। পুঁজিবাদী পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার রাজনীতির বিরুদ্ধে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও রাজনীতিতে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

বিদ্যমান পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতির সঙ্গে নারীর সম্পর্ক ও সংঘর্ষ আমাদের গভীরভাবে ভাবায়। প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে নারীমুক্তির চর্চা ও চিন্তার যে লড়াই চলছে, সেই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকেই এই বইটি লেখার প্রয়াস।

আমি চেয়েছি বইটির প্রচ্ছদ এ সময়ের একজন অগ্রসর শিল্পী ও শিল্পের শিক্ষক দীপ্তি দত্ত করুক। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি প্রচ্ছদটি করেছেন—সেজন্য তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। প্রচ্ছদের ভাবনা নেওয়া হয়েছে সুমনা আক্তারের কাপড় ও সুতায় করা নকশিকাঁথা শিল্পকর্ম 'বিষণ্ন কাঁথা-৪, ২০২৫' থেকে। এই প্রচ্ছদে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে যেভাবে দেখা হয় তারই নির্মোহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

খুব অল্প সময় সত্ত্বেও যত্ন সহকারে দ্যু প্রকাশন বইটি প্রকাশ করার আগ্রহ দেখিয়েছে এবং উদ্যোগ নিয়েছে। তাদের সবার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ।

যে সংকটের কোনো নাম হয় না

নারীর জীবনের লড়াই:
পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে এক নীরব যুদ্ধ

আমাদের দেশের নারীদের একটি বড় অংশ এখনো জানে না তাদের মূল সমস্যা কোথায়। নারীরা অনেক সময়ই বুঝে উঠতে পারে না—তাদের লড়াই আসলে কেন এবং কার বিরুদ্ধে। কিন্তু নারী হিসেবে প্রতিমুহূর্তে তাদের নানা বাধার মুখোমুখি হতে হয় এবং ঘরে-বাইরে অসংখ্য ছোট ছোট লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। অধিকাংশ নারী মানুষ হিসেবে, রাষ্ট্র ও সমাজে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া তো দূরের কথা—নিজের পরিবারেই তা খুঁজে পায় না।

গৃহিণীদের নিজেদের মধ্যে কিংবা পিতা, স্বামী ও পুত্রের সঙ্গে নানা গৌণ বিষয় নিয়ে কলহ চলতে দেখি, যা নারীকে তিক্ত, ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত করে। অথচ মৌলিক পরিবর্তনের প্রশ্নে যেমন সম্পত্তিতে সমানাধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে নগণ্য কয়েকজন লড়াই করেন। শ্রমজীবী নারীদের ক্ষেত্রে মালিক বা গৃহকর্তার বিরুদ্ধে লড়াই দেখা যায়। মালিকের অর্থনৈতিক শোষণকে তারা যতটা চিহ্নিত করতে পারে, পরিবারে চলমান লিঙ্গভিত্তিক শোষণ ততটা সহজে বুঝতে পারে না। হাজার বছরের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীর

মানসিক কাঠামো এমনভাবে নির্মাণ করেছে, যাতে সে নিজেই পুরুষতন্ত্রের নিপীড়ন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে না পারে।

অবশ্য কিছু সংখ্যক নারী এই শোষণকে বুঝতে পারে এবং সচেতনভাবে এর বিরুদ্ধে লড়াই করে। কিন্তু আমরা প্রায়ই দেখি—অনেক নারী পরিবারের কাছ থেকে সামান্য স্বীকৃতির জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে; অথচ স্বীকৃতি তো দূরের কথা, বেশিরভাগ সময় তারা অবজ্ঞা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্যই পায়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ নারী বিয়ের মাধ্যমে বাবার ঘর থেকে স্বামীর ঘরে এক ধরনের 'সম্পত্তির মতো হস্তান্তরিত' হয়। ফলে নিজের আলাদা কোনো অবস্থান বা পরিচয় থাকে না বললেই চলে। স্বামীর বাড়িতে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ও অচেনা এক পরিবারের অংশ হতে হয় এবং সেই পরিবারের গৃহস্থালির প্রায় সব কাজ তাকেই করতে হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, পুঁজিবাদী সমাজে সম্পত্তি-অধিকার থেকে বঞ্চিত নারীরা পিতা, স্বামী কিংবা পুত্রের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়। সারাজীবন এই পরনির্ভরতার যন্ত্রণা বয়ে বেড়াতে হয় তাদের।

এমনকি কর্মজীবী নারীরাও তার বাইরে নয়—তাদের উপার্জনের বড় অংশ বহু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করে পরিবারের পুরুষ কর্তা। শ্রমিক পরিবারেও একই চিত্র দেখা যায়। যদিও বুর্জোয়া পরিবারের কিছু পুরোনো কাঠামো ভাঙতে শুরু করেছে, তবুও সামগ্রিক পরিস্থিতি বদলাতে এখনও অনেক পথ বাকি।

এই একঘেয়ে ও কঠোর সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে চলতে চলতেই নারীর জীবন ধীরে ধীরে বিষাদময় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত নারীরা নিজের জীবনের বহু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না। খাওয়া-পড়া, ন্যূনতম নিরাপত্তা বা স্বাচ্ছন্দ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের ভেতরে প্রায়ই কোনো কারণ ছাড়াই মন

খারাপের অনুভূতি কাজ করে, জীবনকে অর্থহীন বা বিষণ্ন মনে হয়। এই অনুভূতির ব্যাখ্যা তারা নিজেরাও খুঁজে পায় না।

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা পৃথিবীর আরেক প্রান্তের নারীর সঙ্গে আমাদের এখানকার নারীদের মনস্তত্ত্বের আশ্চর্য মিল দেখতে পাই। আমেরিকান নারীবাদী লেখক বেটি ফ্রাইডেন তাঁর বিখ্যাত বই *The Feminine Mystique*-এ এই বাস্তবতাকে গভীরভাবে তুলে ধরেছেন। বইটির প্রথম অধ্যায়ের নাম—'The Problem That Has No Name' বা 'যে সংকটের কোনো নাম হয় না'। আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর আলোচিত সমস্যা আজও আমাদের দেশের নারীদের জীবন বিশ্লেষণে সমভাবে প্রযোজ্য।

বেটি ফ্রাইডেন ১৯৫০ এবং ৬০-এর দশকের আমেরিকান মধ্যবিত্ত নারীদের পারিবারিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তা ছিল এক ঘূর্ণিপাকে আবদ্ধ জীবন। তারা মনে করত—বিয়েই তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। পড়ালেখা তাদের কাছে ছিল শুধু বিয়ের প্রস্তুতির অংশ। রান্নাঘর, ঘর-সংসার এবং একঘেয়ে পারিবারিক চক্রের মধ্যে তাদের জীবন ধীরে ধীরে বন্দি হয়ে যেত। বছরের পর বছর এই চক্রই চলত—সমাজ এবং নারীর নিজস্ব চিন্তাপদ্ধতি দুই-ই এই ফাঁদকে স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিত।

তবে বড় প্রশ্নটি রয়ে যায়—বড় বাড়ি, আধুনিক রান্নাঘর, স্বামীর ভালো চাকরি বা ব্যবসা, আর্থিকভাবে স্বচ্ছল জীবন—সবকিছু থাকা সত্ত্বেও কেন আমেরিকার মধ্যবিত্ত নারীদের মধ্যে এত গভীর বিষণ্নতা তৈরি হয়েছিল? তারা নিজেরাও কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না। কিন্তু মন খারাপ, অবসাদ, অর্থহীনতার অনুভূতি তাদের দৈনন্দিন জীবনে অশান্তি

তৈরি করছিল। তারা চিকিৎসার জন্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হচ্ছিল। পরিবারের লোকজন আবার এই স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও নিজেকে অসুখী ভাবার জন্য তাদের তিরস্কার করত। সমাজ ও পরিবার পরামর্শ দিত—আরও ভালোভাবে সংসার, স্বামী ও সন্তানের প্রতি মনোযোগী হওয়ার।

কিন্তু নারীদের এই সমস্যার প্রকৃত উৎস এবং মুক্তির পথ খুঁজে বের করা ছিল জরুরি। এই জায়গাতেই বেটি ফ্রাইডেন অত্যন্ত স্পষ্ট ও যুগান্তকারী প্রশ্ন তুলেছেন।

অদ্ভুত মিল—আমেরিকা হোক বা বাংলাদেশ, নারীর জীবনচক্র কি সত্যিই খুব আলাদা? স্বামী, সংসার, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য—এসবই কি নারী জীবনের একমাত্র সমাধান হতে পারে? একজন সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে মুক্তভাবে বাঁচার স্বাদ নারীও পেতে চাইবে—এটাই স্বাভাবিক।

একটি মুক্ত সমাজ নির্মাণে নারীর লড়াই আজও অব্যাহত, এবং সেই লড়াই চলবে যতক্ষণ না নারীর অস্তিত্ব, সম্মান ও স্বাধীনতা পূর্ণভাবে স্বীকৃত হয়।

নিজের অভিজ্ঞতা:
নারীর শোচনীয় বাস্তবতা থেকে বোধের জন্ম

নারীর এই শোচনীয় অবস্থার শিকড় খুঁজতে গিয়ে আমি নিজের এবং আশেপাশের নারীদের বেড়ে ওঠা ও সংগ্রামের ঘটনাবলি ফিরে দেখার চেষ্টা করেছি। পিছিয়ে থাকা বা এগিয়ে যাওয়া—প্রতিটি নারীর জীবনেই রয়েছে কঠিন সংগ্রামের ইতিহাস। সচেতন বা অবচেতনভাবে প্রতিনিয়ত এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার পথে হাঁটতে হাঁটতে নিজের জীবনের সঙ্গে অসংখ্য নারীর জীবনের মিল খুঁজে পেয়েছি।

সেই বোধ থেকেই ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পুরুষতান্ত্রিক নিপীড়নের যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি আমি বা আমার আশেপাশের নারীরা হয়েছি—তা আমাকে বারবার ভাবিয়েছে। যখন অন্য নারীদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার মিল খুঁজে পেয়েছি, তখন থেকেই নারীর প্রতি সহমর্মিতা ও সংহতির অনুভূতি গভীর হয়েছে। এর ফলেই জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ—যে কোনো নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানসিকতা তৈরি হয়েছে।

কন্যা শিশুর বেড়ে ওঠা: কেন আমরা সময়মতো প্রতিবাদ করতে পারিনি?

আমাদের দেশে কন্যা শিশুরা যে পরিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিনিষেধের মধ্যে থেকে বড় হয়, তার ফলে স্বাভাবিক চিন্তার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। মাধ্যমিক পর্যন্ত আমার চিন্তায় তেমন পরিবর্তন হয়নি। তখন পর্যন্ত কিছু ঘটনা মনে দাগ ফেললেও কন্যা শিশুর ওপর বৈষম্য, যৌননিপীড়ন বা নারীর প্রতি অবিচার আমাকে ব্যাপক নাড়া দেয়নি। এমনকি নিজের সঙ্গে ঘটে যাওয়া কিছু নিপীড়নের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করার সাহস পাইনি। সঙ্গত কারণেই বিষয়গুলো বুঝতে পারার সময় থেকে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি।

আমাদের দেশের অধিকাংশ কন্যা শিশু ও কিশোরীর জন্য এ এক স্বাভাবিক বাস্তবতা। তারা প্রতিবাদ করতে পারে না—কারণ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র—কেউই তাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো নিরাপদ পরিসর দেয় না। ঘৃণা ও ভয় নিয়ে নীরবে সহ্য করে যায় বিশাল একটি অংশ।

মুশকিল হয় তখন, যখন কোনো নারী প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়ায়। তখন সে আরও ভয়াবহ নিপীড়নের মুখে

পড়ে—ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক উভয়ভাবে। এমনকি তথাকথিত প্রগতিশীল বা নারীবাদী ব্যক্তিরাও অনেক সময় ধর্ষণ ছাড়া অন্যান্য যৌননিপীড়নকে গুরুত্বই দেন না বা স্বীকার করেন না। আমার মতো আরও বহু নারী জানেন—যৌন সহিংসতার বিচার চাইতে গেলে একজন নারীকে কত রকমের অপমান, হুমকি, হয়রানি সহ্য করতে হয়। এই অভিজ্ঞতা আপনাকে প্রতিনিয়ত বিপর্যস্ত করবে, কিন্তু একই সঙ্গে সাহসী ও সতর্কও করে তুলবে। আর তাতেই চেনা যাবে পুরুষতন্ত্রের ধ্বজাধারী ছদ্ম নারীবাদীদের মুখোশ।

শৈশবের শিক্ষা: পরিবার, সমাজ ও বৈষম্যের সূচনা

বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা ও সামাজিক পরিবেশ শিশু বয়স থেকেই নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করে। পরিবার, সমাজ, শিক্ষা—সব প্রতিষ্ঠান মিলেই আমাকে শিখিয়েছে কেন আমি পুত্র শিশুর মতো নই। পিতা-মাতার ভালোবাসা আমাদের কাছে স্বর্গীয় হলেও তারা নিজেরাও রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরে যেতে পারেননি।

তবে আমার সৌভাগ্য ছিল—আমার বাবা অত্যন্ত উদার, প্রগতিশীল ও সংবেদনশীল মানুষ ছিলেন। তিনি বারবার আমাদের বলতেন—মানুষ হিসেবে ছেলে-মেয়ের কোনো পার্থক্য নেই। এই বোধটি শৈশবেই মনে স্থায়ীভাবে গেঁথে যায়। হয়তো সেই কারণেই সমাজের নারীদের বিষয়ে প্রচলিত ধারণার সঙ্গে আমার বোধের কখনো মিল হয়নি।

আমার ছোট বোনও অল্প বয়সেই বৈষম্য খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে পারত, বিশেষ করে খাবারের বৈষম্য—যেখানে পুত্রকে সবসময় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। ভাইয়ের ব্যাপারে এসব যেন স্বাভাবিক, কিন্তু ছোট বোন এসব বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবাদ করত।

কৈশোরের লড়াই:
সমাজের নিষেধ ও বখাটেদের উৎপাত

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময়টা আনন্দময় হলেও উচ্চ বিদ্যালয়ে উঠতেই বিপত্তি শুরু হয়। কৈশোরে পা রাখা মাত্রই পরিবার ও সমাজের অসংখ্য নিষেধ, সতর্কতা ও বাধা আমাদের ঘিরে ধরে। কারণ পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই পুরুষতান্ত্রিক চিন্তার ভেতরে আবদ্ধ ছিল।

স্কুলে যাওয়া-আসার পথে বখাটেদের উৎপাত ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তাতে আমরা ভয়ানক বিপর্যস্ত হতাম। কিন্তু আরও বেদনাদায়ক ছিল—কেন ছেলেরা উত্যক্ত করে তার জবাবদিহি করতে হতো আমাদেরই। এখনও দেশের অসংখ্য কন্যা শিশুকে একই অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে যেতে হয়।

আমার ছোট বোন খেলাধুলায় পারদর্শী ছিল, কিন্তু খেলতে যেতে হলেও ভাইয়ের অনুমতির প্রয়োজন হতো—যা নিয়ে নিয়মিত লড়াই চলত।

কৈশোরে এই বোধ জন্মায় সমাজের প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার বাইরে গেলেই নারীর ওপর ঘরে-বাইরে বিরাট আক্রমণ নেমে আসে। নারী যদি পুরোনো সামাজিক ধারণাকে আঘাত করে তাহলে তাকে 'নষ্ট মেয়ে' বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই আচরণ কম বয়সেই আমাদের মনে গভীর ক্ষত তৈরি করেছিল। পুরুষতন্ত্র নারীর চরিত্র 'ফুলের মতো পবিত্র' থাকার মতো অদ্ভুত এক ধারণা সমাজে তৈরি করেছে। আবার একই সঙ্গে নারীর ওপর নীরবে বা সরবে যৌননিপীড়ন ও নানা শোষণ-জুলুম চালাতে থাকে! চরিত্র পূতপবিত্র প্রমাণ করার জন্য নারীরা যেন এসব অন্যায় নীরবে-নিভৃতে মেনে নেয়—এটাই তাদের একটা ফাঁদ।

সমাজের মুখোশ উন্মোচন:
চরিত্রগত শুদ্ধতার ভ্রান্ত ধারণা

নারীর তথাকথিত চরিত্রগত শুদ্ধতার বিরুদ্ধে প্রথম বড় ধাক্কা আসে গ্রামের একটি ঘটনার মাধ্যমে। দরিদ্র এক মেয়ের বিয়ে ছাড়া মা হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো গ্রাম তার চরিত্র হননে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ছেলেটির অন্যায় কেউই প্রশ্ন করেনি। আমরা তিন বোন এবং বাবা স্পষ্টভাবে মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়েছিলাম—যদিও ছেলেটি ছিল আমাদের আত্মীয়স্থানীয়।

ওই নারীর সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি আমাদের কাছে ভয়াবহ অন্যায় বলে মনে হয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর শক্তিটা তখন থেকেই আমাদের মধ্যে মূল্যবোধ হিসেবে গড়ে উঠেছে।

এছাড়া আমার এক খেলার সঙ্গীর খুব কম বয়সে গর্ভপাত ঘটানোর সময় মৃত্যু হয়েছিল। তার মৃত্যুর কারণ হিসেবে অন্য কোনো অসুস্থতার কথা বলা হয়েছিল। এই ঘটনাটি আজও ভুলতে পারিনি। প্রেমে প্রতারণা, সামাজিক লজ্জা ও গোপনীয়তা—এই সবই নারীকে মৃত্যুর দিকে প্রায়ই ঠেলে দেয়। আধা-সামন্ততান্ত্রিক পুঁজিবাদী-পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের প্রতারণা প্রায় স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নেওয়া হয়—নারীই যার প্রধান শিকার হয়ে থাকে।

মায়ের জীবনে পুরুষতন্ত্র:
অসচেতন লড়াইয়ের প্রতিচ্ছবি

পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে অসচেতন লড়াইয়ের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমার মা। তিনি বিয়ের আগে গান-নাচ, বইপড়া—এসব ভালোবাসতেন। কিন্তু বিয়ের পর নিজের ভালোলাগা সবই পরিত্যাগ করতে হয়। যদিও তিনি ছিলেন